ইস্যু নং: ০২
২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

বান্দরবানে ভূমি বেদখলের ভয়াবহ চিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল বান্দরবানে ১১টি পাহাড়ি জাতিসত্তার বাস। উত্তর ও মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের তুলনায় এ অঞ্চলের জাতিসত্তাসমূহ শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। ভূমি এবং বন তাদের জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। এই ভূমি ও বন থেকে উৎখাতের মাধ্যমে তাদের জাতিগত অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দেয়ার জন্য বিগত কয়েক দশক ধরে সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে। চলছে নীরব এথনিক ক্লিনজিং বা জাতিসত্তা নিধনযজ্ঞ। এই পদ্ধতিতে একটি জাতিসত্তাকে লুপ্ত করে দেয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠিগুলো গণহত্যার পরিবর্তে এমন পদ্ধতি বা পদ্ধতি-সমষ্টির আশ্রয় নেয় যাতে নীরবে ও ধীর লয়ে ঐ নির্দীষ্ট জাতিসত্তাগুলো নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। এথনিক ক্লিনজিং-এর নীরব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ভূমি থেকে উৎখাতকরণ, লঘুমাত্রায় সামরিক নির্যাতন, জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর প্রয়োগ, উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিতকরণ ও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ, প্রচারণা ও নানা কৌশলে জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে জাতীয় হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি করে দেয়া ইত্যাদি।

এক নজরে বান্দরবানে বেদখল হওয়া মোট জমির পরিমাণ:

ক. সামরিক বাহিনীর দখলে	৩৭,৬২৬.৪৫ একর
খ. বনবিভাগের অধীন জমি	৩,০০,০০০.০০ একর
গ. রাবার বাগান ও হর্টিকালচার	৪০,০৭৭.০০ একর
ঘ. সেটলারদের দখলে থাকা জমি	১,৯১,৮৩৪.৯৫ একর
মোট:	৫,৬৯,৫৩৮.৪০ একর

জেলার মোট জমির ৫৯.৩৮%

বান্দরবানে এই পদ্ধতিগুলোর সবকটিই প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে কয়েকটি জাতিসত্তা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

এথনিক ক্লিনজিং-এর নীরব পদ্ধতিগুলোর আলোচনা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বান্দরবানে সাম্প্রতিক ভূমি বেদখলের সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলতঃ নিম্নোক্ত ৫টি উপায়ে বান্দরবানের জাতিসত্তাসমূহের বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করে আসা যৌথ মালিকানাধীন জমি বেদখল করা হচ্ছে।

ক. রাবার বাগান ও হর্টিকালচার:

বান্দরবান জেলায় সর্বশ্রেণীর ভূমির পরিমাণ ৯,৫৯১৭৪.৭৬ একর। জেলার চারটি উপজেলায় ১,২৩২টি রাবার প্লট ও ৩৭৩টি হর্টিকালচার প্লট মিলিয়ে মোট ১৬০৫টি প্লটের বিপরীতে আজ পর্যন্ত ৪০,০৭৭ একর জমি বিভিন্ন বহিরাগত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে লিজ দেয়া হয়েছে। এই ৪০,০৭৭ একরের মধ্যে রাবার বাগানের জন্য লিজকৃত জমির পরিমাণ হলো ৩০,৭৯৭ একর ও হর্টিকালচারের জন্য ৯,২৮০ একর। লিজের মেয়াদ ৪০ বছর। যাদের নামে বা যে সব প্রতিষ্ঠানের নামে লিজ দেয়া হয়েছে তারা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামে অনাবাসী ও বহিরাগত, জমির সাথে যাদের কোন সম্পর্কই নেই। এভাবে বহিরাগতদেরকে জমি লিজ দেয়ার ফলে একদিকে যেমন পাহাড়িদের ২য় পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

বাবুছড়ার খেটে খাওয়া যে বাঙালি নারীরা সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে ৩ সেপ্টেম্বর ভয়াবহ দাঙ্গা রোধ করতে ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বাবুছড়া ক্যাম্প কমান্ডারকেও, যিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে পেশাগত দায়িত্বশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে দাঙ্গা রোধে সময়োচিত ভূমিকা রেখেছেন।

অপরদিকে, সাধনা টিলার জমি ও মন্দির রক্ষার জন্য যারা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিরোধে সামিল হয়েছেন এবং বহু উস্কানির পরও ধৈর্য্য, সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল।

সত্য ও ন্যায়ের বিজয় অনিবার্য।

ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে ৭ কোরিয়ান সংগঠনের স্মারকলিপি পেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষত সম্প্রতি দীঘিনালায় জোরপূর্বক ভূমি বেদখলের প্রতিবাদ জানিয়ে কোরিয়ার ৭টি মানবাধিকার ও ধর্মীয় সংগঠন ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

সংগঠনগুলো হলো Won Buddhism Human Rights Center, Urinun Sunu, KwangJu Human Rights Activities Center, Dasan Human Rights Center, Student Action Solidarity, Nawauri (I & We), Sarangbang Group for Human Rights.

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রীলংকায় বিক্ষোভ

৫০ জন বাংলাদেশী ও সিনহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখল, সেটলার বসতি সম্প্রসারণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে "বাংলাদেশ জুম্ম বুড্ডিষ্ট মঙ্কস, শ্রীলংকা" এই বিক্ষোভের আয়োজন করে।

বিক্ষোভের আগের দিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর সংগঠনের নেতারা কলম্বোতে ধম্মবিজয় ফাউন্ডেশনে একই বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরা রিপোর্টারসহ বহু সাংবাদিক এতে উপস্থিত ছিলেন। ভদন্ত ইউ. তিস্য চাকমা সিংহলী ভাষায় সংক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। এরপর ভদন্ত জে. চাকমা চলমান ভূমি বেদখল, বাবুছড়ার সাধনা টিলায় সেটলার সম্প্রসারণ চেষ্টা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর হয়রানি-নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা দেন। তাদের আলোচনা শেষে সাংবাদিকবৃন্দ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করলে সেগুলোর জবাব দেন ভদন্ত ইউ. তিষ্য।

সংবাদ সম্মেলনের পূর্বে "বাংলাদেশ জুম্ম বুড্ডিষ্ট মঙ্কস, শ্রীলংকা"-এর তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হন। এ সময় শ্রীলংকা সফররত বাংলাদেশ সরকারের একজন উপদেষ্টাও উপস্থিত ছিলেন। তারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালান। সংবাদ সম্মেলনে যাতে তারা ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন সেজন্য আলোচনা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন এবং শেষে সকল কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে তাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দেন।

অবশ্য বেশ কয়েকদিন আগে থেকে "বাংলাদেশ জুম্ম বুড্ডিষ্ট মঙ্কস, শ্রীলংকা"এর কর্মসূচী ভন্ডুল করে দেয়ার জন্য শেষ পাতায় দেখুন

বান্দরবানে ভূমি বেদখলের ভয়াবহ চিত্র

১ম পাতার পর

চিরাচরিত ভূমি প্রথাকে পদদলিত করা হয়েছে, অন্যদিকে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার ম্রো ও ত্রিপুরা পরিবারকে উৎখাতের শিকার হতে হয়েছে এবং তাদের জীবন ধারণের উপায় সংকুচিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করতে বহু পাহাড়ির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। জমি হারিয়ে, বিকল্প জীবিকার সন্ধান না পেয়ে ও মামলা ঝুলিয়া মাথায় নিয়ে পাহাড়ি পরিবারগুলো এখন সর্বশান্ত ও বিপর্যস্ত। নিজ ভূমিতেই তারা আজ পরবাসী। এর চাইতে মানবেতর আর কি হতে পারে?

জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে জমির ওপর ব্যক্তি মালিকানার ধারণা নতুন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যক্তি মালিকানার প্রবর্তন হয় বৃটিশ আমলে। তাও প্রধানতঃ হালচাষের জমির ক্ষেত্রে। এখানে জমি হলো গোষ্ঠির মালিকানাধীন, ব্যক্তি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ব্যবহারের অধিকার পায়। সুতরাং যদি বাইরে থেকে এসে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর জোর করে তার নিজস্ব আইন চাপিয়ে দিয়ে বলে যে এই জমিতে যেহেতু ব্যক্তি মালিকানা নেই তাই সেই জমি খাস, তাহলে সেটার মতো চরম অবিচার ও অন্যায় আর কি হতে পারে?

খ. সামরিক অজুহাতঃ

সেনা ক্যাম্প ও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের নামে প্রায়শঃ জমি বেদখল করা হয়। বান্দরবানে সামরিক প্রয়োজন দেখিয়ে জমি বেদখলের প্রক্রিয়া এখন জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের নামে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালকসহ ২টি ইউনিয়নের ৪টি মৌজায় ১১,৪৪৫.৪৫ একর জমি বেদখল করা হয়। এতে ৭৫০টি পাহাড়ি ও বাঙালি পরিবার উৎখাত হয়। তাদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হলেও পুনর্বাসন করা হয়নি। এসব পরিবার বর্তমানে হুমকির মধ্যে সেনাবাহিনীকে কর দিয়ে অস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। উক্ত জমি হুকুম দখলের বিরুদ্ধে সে সময় এক বাঙালি মহিলা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আদালতে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু তৎকালীন সেনা কমান্ডারদের হুমকি ও চাপের কারণে মামলাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

রাবার বাগান ও হর্টিকালচারের জন্য লিজ-এর নামে বেদখলকৃত জমির চিত্র

উপজেলার নাম	রাবার প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	হর্টিকালচার প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)
বান্দরবান সদর	৯১টি	২,২৭৫	১১৯টি	২,৮৫৫
লামা	৮৩৫টি	২০,৮৭৫	১৭৭টি	৪,৫০০
আলিকদম	১৯৪টি	৪,৮৪৭	৬২টি	১,৫৫০
নাইক্ষ্যংছড়ি	১১২টি	২,৮০০	১৫টি	৩৭৫

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত উক্ত ১১,৪৪৫.৪৫ একর জমির পাশে আরো ১৯,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ বা বেদখলের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়া বিমান বাহিনীর বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বান্দরবান সদর ও লামা এই দুই উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের অধীন ১৫টি মৌজায় ২০০১ সাল থেকে ২৬,০০০ একর জমি হুকুম দখলের কার্যক্রম চলছে এবং রুমায় প্যারা কমান্ডো ও এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টার-এর নামে ৯,৫৬০ একর জমি বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে। বান্দরবানে ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারণের জন্য ১৮১ একর জমি বেদখল প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়েছে। বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য যে ২৬,০০০ একর জমি হুকুম দখলের কার্যক্রম চলছে তার ফলে ত্রিশ হাজারের বেশী পাহাড়ি পরিবার উচ্ছেদ অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

গ. সংরক্ষিত বনাঞ্চল

সরকার বান্দরবানের ৭টি উপজেলার ৩৫টি মৌজায় ১৯৮২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের নামে ৯৪,০৬৬.৯৭ একর জমি বেদখল করে। এছাড়া প্রজ্ঞাপন বহির্ভূত কিন্তু বন বিভাগের দখলে রয়েছে এমন জমির পরিমাণ হলো ২৩,৯৩৩.০৩ একর। ইতিপূর্বে সৃষ্ট সাংশু সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে জমির পরিমাণ ৮০,০০০ একর ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে জমির পরিমাণ ১,০২,০০০ একর। সব মিলিয়ে বর্তমানে বনবিভাগের অধীনে জমির পরিমাণ হলো ৩,০০,০০০ একর, যা জেলার মোট জমির ৩১.২৮ শতাংশ। সরকার বনবিভাগের মাধ্যমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের নামে নতুন করে আরো ২৭,৪৫০ একর জমি দখলের প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে বনবিভাগের অধীনস্থ জমির পরিমাণ দাঁড়াবে মোট ৩,২৭,৪৫০ একর।

১৯৮২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ৭টি উপজেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের নামে বেদখলকৃত জমির বিবরণঃ

উপজেলা	মৌজা	বেদখলকৃত জমির পরিমাণ
আলিকদম	৩টি মৌজা	৫,৭৫৪.৯৮ একর
নাইক্ষ্যংছড়ি	৩টি মৌজা	৪,৮৪০.০০ একর
লামা	৫টি	২,৭৮০.৯৯ একর
বান্দরবান সদর	৫টি	১৫, ৭৫০.০০ একর
রোয়াংছড়ি	১০টি	৪৫,৯৫০.০০ একর
রুমা	৫টি	১১,৫০০.০০ একর
থানছি	৪টি	৭,৫০০.০০ একর
মোটঃ	**৩৫টি**	**৯৪,০৬৬.৯৭ একর**

বনবিভাগের দখলে থাকা মোট জমির পরিমাণঃ

ক. ১৯৮২-৯৯ ৭টি উপজেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠন	৯৪,০৬৬.৯৭ একর
খ. প্রজ্ঞাপন বহির্ভূত কিন্তু বন বিভাগের দখলে	২৩,৯৩৩.০৩ একর
গ. সাংশু সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল	৮০,০০০.০০ একর
ঘ. মাতামুহুরী সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল	১,০২,০০০.০০ একর
মোটঃ	**৩,০০,০০০.০০ একর**

ঘ. পর্যটন

চিম্বুক পাহাড়ে ম্রো জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকায় সেনাবাহিনীর পরিচালনাধীন পর্যটন কেন্দ্র নীলগিরি ও বনবিভাগের ইকো পার্ক নির্মাণের জন্য ৫,৫০০ একর জমি বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে কাপ্রু ম্রো পাড়া এলাকায় সুরম্য অবকাশ যাপন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। সেনাবাহিনী ঐ গ্রামের ৬০ টি ম্রো পরিবারকে এ বছর তাদের কাটা জুমে আগুন দিতে দেয়নি। ফলে তারা জুম চাষ করতে পারেনি। বিকল্প জীবিকার উৎস না থাকায় অনাহারে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকলো না। পর্যটন কেন্দ্র ও ইকোপার্ক পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে রুমা, থানছি, লামা ও বান্দরবান সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন ও ৫টি মৌজার কয়েক শ' ম্রো ও মারমা জাতিসত্তার পরিবার উচ্ছেদের শিকার হবে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বলপূর্বক উক্ত জমি দখল করা হচ্ছে।

ঙ. বসতিস্থাপন

বান্দরবানে বহিরাগত সেটলারদের পুনর্বাসনের জন্য কি পরিমাণ জমি বেদখল করা হয়েছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এ জেলায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বহু আগে থেকে বহিরাগত অনুপ্রবেশ শুরু হলেও, মূলতঃ ১৯৭৯ সাল থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সেটলার পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত আনুমানিক ৪ লক্ষ বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য পাহাড়িদের হাজার হাজার একর জমি জোর করে দখল করা হয়। বর্তমানে বান্দরবানের ৭টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলায় যেমন আলিকদম, লামা ও নাক্ষ্যংছড়ি বলতে গেলে পাহাড়ি শূন্য। বহু বিস্তীর্ণ এলাকা এখন বহিরাগতদের বেদখলে, যেখানে গ্রামগুলো কয়েক বছর আগেও কেবল পাহাড়িদেরই কোলাহলে মুখর ছিল। আজ সেসব গ্রাম পাহাড়ি-শূন্য। ধারণা করা হয় কম করে হলেও জেলার মোট জমির ২০ শতাংশ সেটলারদের দখলে। এই হিসেবে তাদের দখলে থাকা জমির পরিমাণ হবে ১,৯১,৮৩৪.৯৫ একর।

সুতরাং দেখা যায়, বান্দরবানের মোট জমির ৫৯.৩৮% ইতিমধ্যে পাহাড়িদের বেহাত হয়ে গেছে। বর্তমানে যে বাড়তি জমি বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে তা সফল হলে এই হার আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। ■

লক্ষ্মিছড়িতে দুই বৌদ্ধ শ্রমণ

শেষ পাতার পর

হয়। ইতিপূর্বে তাদের সেবক বৈশিষ্ঠ্য চাকমাকে শুকনাছড়ি গ্রামে ছেড়ে দেয়া হয়। ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদেরকে চরমভাবে হয়রানি ও অপমান করা হয়। শ্রমণদের উদ্বৃতি দিয়ে শুকনাছড়ি গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, "সেনারা ভাবনা কেন্দ্রটি কখন নির্মাণ করা হয় এবং কার নির্দেশে তারা সেখানে ধ্যান করতে গেছেন তা জানতে চায়। উত্তরে শ্রমণরা জানান তারা বনভান্তের নির্দেশে সেখানে ধ্যান করতে গেছেন এবং ভাবনা কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য জায়গা বাছাই করা হয় ২০০৫ সালে এবং তারা এ বছর মার্চ থেকে সেখানে অবস্থান করছেন।"

সেনারা শ্রমণদ্বয়ের ব্যক্তিগত তথ্য পেনসিল দিয়ে কাগজে লিখে তাতে বলপেনে তাদের স্বাক্ষর নেয়। কেন পেনসিল দিয়ে লেখা হয়েছে অথচ স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে মুছে না যায় এমন কালিতে সে রহস্য শ্রমণদের কাছে অজ্ঞাত এবং সে রহস্যের উত্তর কেবল সেনারাই বলতে পারবেন। এরপর রাত আটটার দিকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার পর শ্রমণরা শুকনাছড়ির নবজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারে রাত কাটিয়ে পরদিন রাঙ্গামাটির বনবিহারে চলে যান বলে জানা গেছে। দুই শ্রমণের মধ্যে শাসন উজ্জ্বল শ্রমণের বাড়ি লংগদুর উকছড়িতে এবং নাইক্ষিস্টিক শ্রমণের বাড়ি লান্যাচরের কাটাছড়ি গ্রামে। কবে তারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তা জানা যায়নি।

গভীর বনে ধ্যানরত অবস্থা থেকে শ্রমণদের জোর পূর্বক তুলে নিয়ে আসার ঘটনায় পুরো এলাকায় চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর উর্ধে। তারা অহিংসার পূজারী ও জীবহত্যা থেকে নিরত। সুতরাং যারা গৃহ সংসার ত্যাগ করে সমস্ত লোভ, হিংসা ও দ্বেষ-এর উর্ধে উঠে আত্মমুক্তি নির্বাণ লাভের জন্য ধ্যানমগ্ন হন, তাদেরকে যদি এভাবে নিগ্রহের শিকার হতে হয়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ মানুষের কী অধিকার থাকতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। তাহলে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবে না? সংসার বৈরাগী হয়ে আত্মমুক্তির জন্য ধ্যান করার অধিকারও কি আমাদের নেই? আমরা এই রাষ্ট্রের কাছে, আমাদের ওপর নিপীড়নকারী আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠির কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। আমরা আরো জানতে চাই, কি অপরাধ ছিল ঐ দুই বৌদ্ধ শ্রমণের, যার কারণে তাদেরকে এভাবে ধ্যানস্থল থেকে আটক করে নিয়ে আসতে হবে? তাদের বিরুদ্ধে কি কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা কিংবা কোন থানার মামলা ছিল? যদি তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকতো তাহলে সেনা সদস্যরা তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করতো। কিন্তু যেহেতু তারা তা করেনি, সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল না। সেটা যদি না থাকে এবং দেশে যদি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার থাকে, তাহলে উক্ত দুই শ্রমণকে তাদের নির্ধারিত ধ্যানস্থল তুজুলিচুক পাহাড়ে ধ্যান করতে দেয়া হোক। এটাই আমাদের তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী মানুষের দাবি।

যেভাবে দাঙ্গা থেকে রক্ষা পেলো দীঘিনালাবাসী

অনিম চাকমা

এটা এখন পরিষ্কার যে, উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক এক সেনা কমান্ডার ও তার মদদপুষ্ট দালাল কিছু সেটলারের উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে সাধনা টিলা জোরপূর্বক দখল করা। কিন্তু তাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। বাবুছড়া বাজারের কয়েকজন বাঙালি মহিলা সত্যের পক্ষে না দাঁড়ালে সেদিন এক ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য বাবুছড়া ক্যাম্প কমান্ডারও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে তড়িৎ ব্যবস্থা নিয়ে পেশাগত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন।

বেশ কয়েকদিন ধরে জনৈক উগ্রবাদী সেনা কমান্ডারের দালাল কিছু সেটলার দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য অজুহাত খুঁজছিল। এজন্য তারা উস্কানিমূলকভাবে বনবিহারের ঘেরার মধ্যে ঢুকে গাছপালা কাটতে থাকে এবং পাহাড়িদের বাড়ির উঠোনে ও ক্ষেতে বাড়িঘর নির্মাণ করে। বাধা দিলে তারা ফুঁসে উঠে ও মারমুখী হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পাহাড়িদের ধৈর্য্য ও সংযমের কারণে শেষ পর্যন্ত সেটলাররা দাঙ্গা বাঁধানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

অপরদিকে, বাবুছড়া বাজারের কয়েকজন পরিচিত বাঙালি মেয়ে সেটলারদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে থাকে: "তোমরা না জেনে এ কাজ করো না, আমরা সব দেখেছি। আব্বাস নিজেই নিজের পিঠে কাদা মেখে ঘটনা সাজিয়েছে। তাকে কেউ কোন কিছু করেনি।"

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাধনা টিলায় সবচেয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ দিন সেখানে দীঘিনালার টিএনও-র আসার কথা ছিল। সকালে মেরুং ও অন্যান্য এলাকা থেকে ৩ শতাধিক সেটলার সাধনা টিলায় এসে অবস্থান নেয়। একইভাবে পাহাড়িরাও তাদের জমি ও মন্দির রক্ষার জন্য সাধনা টিলায় জড়ো হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার বাক বিতণ্ডাও হয়। অনেক অপেক্ষার পর টিএনও না আসলে পাহাড়িরা বিকেল ৩টার দিকে সাধনা টিলা ত্যাগ করে। কেবল ৭-৮ জন নারী বনবিহারে কাজের জন্য থেকে যায়।

ঠিক এই সুযোগে সোল্লা তিনটার দিকে বাবুছড়া বাজারের রেডিও মেকানিক মোঃ আব্বাস তার স্ত্রীসহ বনবিহারের কুটিরের পার্শ্ববর্তী জায়গায় বাড়ি তৈরির কাজ করে এবং কুটির ভাঙতে থাকে। একজন বৌদ্ধ শ্রমণ বাধা দিলে সে আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে কুটির ভাঙার কাজ করে। শ্রমণ ঐ অবস্থায় আব্বাসের ছবি তুলতে গেলে তার স্ত্রী তা দেখে ফেলে এবং চিৎকার করতে থাকে। অপরদিকে আব্বাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শরীরে কাদা মেখে চিৎকার করে বলতে থাকে যে তাকে মারধর করা হয়েছে। কিছু দূরে অবস্থান করা অন্য সেটলাররা তার কাছে এগিয়ে আসে এবং কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে। সে তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে। "ওরা আমাকে মেরেছে, সবাইকে কুপিয়ে শেষ করে দাও" - এই বলে সে অন্যান্য সেটলারদেরকে হামলায় প্ররোচিত করে। তার কথা শুনে সেটলাররা ভিক্ষু, শ্রমণ এবং মেয়েদের ওপর হামলা করতে উদ্যত হলে ভিক্ষুরা বাঁধা দেয়। অপরদিকে, বাবুছড়া বাজারের কয়েকজন পরিচিত বাঙালি মেয়ে সেটলারদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে থাকে: "তোমরা না জেনে এ কাজ করো না, আমরা সব দেখেছি। আব্বাস নিজেই নিজের পিঠে কাদা মেখে ঘটনা সাজিয়েছে। তাকে কেউ কোন কিছু করেনি।" এই বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একজন হলেন চম্পা মা। তিনি মুড়ি বিক্রি করে খান। পাহাড়িদের সাথে মেলামেশা করেন। অন্যদেরও পাহাড়িদের সাথে সখ্যতা/উঠাবসা রয়েছে। এই বাঙালি নারীরা মারমুখী সেটলারদের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলো বললে তারা ক্ষান্ত হয়। এদিকে সেটলারদের চিৎকার শুনে কী হয়েছে তার খোঁজ নিতে ক্যাপ পরিহিত তিন জন যুবক বনবিহারের দিকে দৌঁড়াতে থাকে। তাদেরকে ইউপিডিএফ কর্মি মনে করে সেটলাররা আস্তে আস্তে রাস্তার পাশে এসে জড়ো হয়। ভিক্ষু ও নারীদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়লে দীঘিনালার নারিকেল বাগান থেকে বাবুছড়া নতুন বাজারের উপরদিক পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে পাহাড়িরা অবস্থান নেয়। পরে আক্রমণ হওয়ার গুজব মিথ্যে বলে জানাজানি হলে পাহাড়িরাও নিবৃত্ত হয়।

পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে এ রকম মারমুখী অবস্থান দেখে বাবুছড়া ক্যাম্প থেকে সেনা সদস্যদের নামানো হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য স্বয়ং জোন কমান্ডার দ্রুত মাঠে নেমে পড়েন। সেটলাররা সেনা সদস্যদেরকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু বাবুছড়া জোন কমান্ডার তাদের কথা শোনার পর খোকন নামে এক পাহাড়ি ছেলেকে নিয়ে বনবিহারে যান এবং ভিক্ষু ও শ্রমণদের বক্তব্যও শোনেন। তিনি মন্তব্য করেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কারো গায়ে হাত তুলবেন এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি জানান তিনি মোঃ অরুপ বড়ুয়ার সাথে (বাঘাইহাটে দায়িত্বে ছিলেন) বহুবার বিহারে গেছেন এবং ভিক্ষুদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতপর তিনি ঘোষণা দেন যে "আজ থেকে কোন বাঙালি বনবিহার এলাকায় ঢুকবে না।" জোন কমান্ডার বনবিহার এলাকায় জায়গার পরিমাণ কত, বিহারের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ও জেনে নেন।

ঘটনা পরম্পরা প্রমাণ করেছে কে দাঙ্গার আসল ষড়যন্ত্রকারী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে দীঘিনালা জোনের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মেজর কামরুল হাসানই আসল দুস্কৃতকারী। দীঘিনালায় বদলী হওয়ার পর থেকেই পাহাড়িদের জায়গা জমি বেদখলের জন্য সেটলারদের উনি প্রতিনিয়ত উস্কানি দিতে থাকেন, তার প্রত্যক্ষ মদদ থাকায় সেটলাররা পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিতে এবং পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্র আঁতার সাহস পেয়েছে। মূলতঃ তার কারণেই দীঘিনালাবাসী শান্তিতে থাকতে পারছে না। জনগণের দাবি অচিরেই তার কৃত অপকর্মের শাস্তি হোক এবং বেদখল হওয়া পাহাড়িদের জমি ফেরত দেয়া হোক। ■

লক্ষ্মিছড়িতে দুই বৌদ্ধ শ্রমণ আটক ও পরে মুক্তি ভাবনা কেন্দ্র ভেঙে দেয়া হয়েছে

যারা ঘর সংসার, পরিবার ও বন্ধু পরিজন ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়ে গহীন বনে ধ্যানমগ্ন হয়ে চিত্ত জয়ের মাধ্যমে নির্বাণ লাভের পথ ধরতে মনস্থির করেছেন, তারা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখুন। জাতিগত নিপীড়নের যে স্টিমরোলার চালানো হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর ওপর, তা কাউকে রেহাই দেয় না। এমনকি প্রব্রজ্যাধারী হলেও রক্ষে নেই। সব কিছু ছেড়ে গহীন বনে ধ্যানমগ্ন হওয়ার অধিকারও যেন এই রাষ্ট্র পাহাড়িদের দেয় না। এ কোন গাল গল্প কিংবা বানানো অভিযোগ নয়। সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই কথাগুলো বলা। কি সেই ঘটনা? শুনুন তাহলে।

গুঁড়িয়ে দেয়ার পর ভুজুপি ভাবনা কেন্দ্র

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষিছড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে। গুকনাছড়ি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন রায়হানের নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি সেনা দল গত ১৭ জুলাই ভুজুলিচুক পাহাড়ে যায়, ধ্যানস্থল "ভুজুপি ভাবনা কেন্দ্র" গুঁড়িয়ে দেয় এবং পাহাড়ের চূড়ায় ধ্যানরত দুই বৌদ্ধ সন্যাসীকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদেরকে হয়রানি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় গুরু বনভান্তের শিষ্য বলে পরিচিত উক্ত দুই সন্যাসী হলেন শাসন উজ্জ্বল শ্রমণ (২২) ও নাইকিস্টিক শ্রমণ (২৬)। এছাড়া তাদের সেবক বৈশিষ্ট্য চাকমাকেও সৈন্যরা সেখান থেকে আটক করে নিয়ে আসে। তার বাড়ি লক্ষিছড়ি ও পিতার নাম খগেন্দ্র চাকমা।

গুকনাছড়ি থেকে সন্যাসীদের ধ্যানের স্থল ভুজুলিচুক পাহাড়ে পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগে ৪ - ৫ ঘন্টা। সেনারা উক্ত এলাকা ঘিরে ফেলে শ্রমণদেরকে তাদের জিনিসপত্র সহ সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তারা রাজী না হলে হুমকি দেয় ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এতেও কোন কাজ না হলে সেনারা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আসে। এছাড়া সেনারা ভাবনা কেন্দ্রের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে দেয় ও আক্রোশবশতঃ বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত বাঁশটি কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। বিকেল ৬টার দিকে তাদেরকে গুকনাছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে আসা ৩য় পাতায় দেখুন

দীঘিনালায় ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রবাসীদের স্মারকলিপি পেশ

অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী পাহাড়িদের একটি সংগঠন ইউনাটেড জুম্ম ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক দীঘিনালাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত ভূমি বেদখল ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ দিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড-এর কাছে আবেদন জানিয়েছে।

সংগঠনটির সভাপতি বিশ্বজিৎ চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক বিপুলানন্দ চাকমা গত ৪ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে এই আবেদন জানান। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, শ্রীলংকা, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া ও জাপানের ৫৬ ব্যক্তি এই চিঠির প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

চিঠিতে দীঘিনালায় সাম্প্রতিক ভূমি আগ্রাসনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তা বন্ধের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন কামনা করা হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফকরুদ্দীন আহমেদের কাছেও একটি চিঠি দিয়ে অবিলম্বে দীঘিনালাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ভূমি বেদখল বন্ধ করা, সাধনা টিলায় সেটলার বসতি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিকীকরণ শুরু করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা সহ বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন।

সাধনা টিলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিটি গঠিত

গত ৭ সেপ্টেম্বর বাবুছড়া ইউপি কার্যালয়ে টিএনওর সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও মুরুব্বীদের এক মিটিঙে সাধনা টিলা দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। পাহাড়ি বাঙালি সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হলেন ইউপি মেম্বার ও হেডম্যান পোপাদেবী চাকমা ও সদস্য সচিব সত্যেন্দ্রিয় চাকমা।

উক্ত মিটিঙে আরো উপস্থিত ছিলেন কবাখালি ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্ব কল্যাণ চাকমা, বোয়ালখালি ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ রানা, মেরুং ইউপি চেয়ারম্যান মোসলেম উদ্দীন, বাবুছড়া ও বড়াদাম সেনা ক্যাম্পের দুই কমান্ডার, এলাকার মুরুব্বী জ্যোতির্ময় চাকমা, স্নেহ ময় চাকমা, অরুণ বিকাশ চাকমা, ইউপি মেম্বার মাহবুব, আব্দুল মালেক ও ৭ জন মহিলা ইউপি মেম্বার সহ আরো বেশ কয়েক জন।

কমিটি গঠনের পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ঐদিন সাধনা টিলার দিকে সেটলার ও পাহাড়িদের আলাদাভাবে বহনকারী জীপ যেতে চাইলে সেনাবাহিনী বাধা দেয়। তবে এখনো পর্যন্ত সেনাবাহিনী কিংবা প্রশাসন কোন মহলের পক্ষ থেকে সাধনা টিলায় সেটলার বসানোর পরিকল্পনা বাতিলের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রীলংকায় বিক্ষোভ

১ম পাতার পর

কলম্বোস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। ৭ সেপ্টেম্বর সংগঠনের নেতারা কলম্বোস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে তাদের কর্মসূচী সম্পর্কে আগাম অবহিত করলে হাই কমিশনে হতচকিতভাব লক্ষ্য করা যায়। হাই কমিশনার স্বয়ং সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে একই সাথে কথার ফুলঝুড়ি ও হুমকি-ধামকি দিয়ে উক্ত কর্মসূচী থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালান। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন তারা কি চান। এর জবাবে নেতৃবৃন্দ সাধারণভাবে তাদের দাবি উত্থাপন করলে তিনি দিগীনালার ভারপ্রাপ্ত জোন কমান্ডার মেজর কামরুল হাসানকে সেখান থেকে বদলি করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট না হয়ে তারা বলেন দীঘিনালাবাসী তার উপযুক্ত শাস্তি ছাড়া অন্য কিছু মানবে না। তখন হাই কমিশনার বলেন, "ঠিক আছে, আমরা তাই করবো যদি আপনারা এখানে বিক্ষোভ না করেন।"

এরপর আর আলোচনা অগ্রসর হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যায় বাসস্থানে ফিরে আসার পর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মোবাইল ফোনে বেশ কয়েকটি কল পান। কলাররা উষাতন তালুকদার (আঞ্চলিক পরিষদ), সিতং চাকমা ও বেণী মাধব বড়ুয়া পরিচয় দিয়ে তাদেরকে তাদের ঘোষিত কর্মসূচী বাদ দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এমন কি বিক্ষোভ করা হলে তা তাদের পরিবারের সদস্য ও সামগ্রিকভাবে পাহাড়িদের স্বার্থের বিপক্ষে যাবে বলে তারা হুমকি দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিক্ষুরা তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচী চালিয়ে যেতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং সকল ধরনের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন।

শ্রীলংকায় পাহাড়ি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের দমন করতে যখন হুমকি সব ধরনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, তখন তাদের মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশন নতুন এক চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। তারা দালাল বৌদ্ধ সংগঠন খুঁজতে থাকে এবং পেয়েও যায়। অতঃপর অর্থ দিয়ে যা যা করা সম্ভব হাই কমিশন তাই করে। আদর্শ কুমার বড়ুয়া নামে তথাকথিত বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সকল ধরনের নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সংবাদ পত্রে এক হাস্যকর বিবৃতি দেয়, যা ১২ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত দালালটি হাই কমিশনের নির্দেশমত আজগুবি বক্তব্য দিয়ে "বাংলাদেশ জুম্ম বুদ্ধিষ্ট মন্ডস, শ্রীলংকা"-এর বিক্ষোভ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সব কালে দালাল ও কুলাঙ্গার থাকে। মীর জাফর, বিভীষণ ও বুদ্ধের সময়কার দেবদত্তের যোগ্য উত্তরসূরী হলেন আদর্শ কুমার বড়ুয়া।

জরুরী যোগাযোগ: pitribhumi@yahoo.com